বনফুল

নিতাই বসু

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

॥ ১ ॥

বনফুলের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার শিয়াখালা গ্রামে। বাস্তুভিটার অদূরে কাঁটাবন ছিল বলে ওঁদের পরিবার 'কাঁটাবুনে মুখুজ্জে' নামে খ্যাত ছিলেন। বনফুলের পিতামহ কেদারনাথ ছিলেন সংগীতজ্ঞ, তান্ত্রিক এবং কালীসাধক।

বনফুলের বয়স যখন সাত, তখন তাঁর জীবজন্তু পোষার খুব শখ ছিল। কয়েকটি কুকুরছানা, কয়েকটি বেজি ও বিলিতি খরগোস, একঝাঁক পায়রা, শালিক, টিয়া এবং একঝাঁক সাদা বিলিতি ইঁদুর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই অনেক উৎসাহ- উদ্দীপনা, অনেক হর্ষ-বিষাদ তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করেছে। বাড়িতে দেশি ও বিলিতি কুকুর ছিল তিনটি—বাঘা, কালো আর টম। বাঘাকে তাঁর মা বিশেষ সমীহ করে চলতেন। সে একাদশীর দিন উপোস করত। বনফুলের মায়ের ধারণা ছিল, বাঘা কোনো অভিশাপগ্রস্ত মহাপুরুষ। 'বাঘা' গল্পে বনফুল অভিশাপগ্রস্ত মহাপুরুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

একসময় তিনি মাছ নিয়ে মেতে উঠলেন। পাড়াগাঁয়ে রঙিন মাছ পাওয়ার কথা নয়। হাটে খলসে মাছের মতো মাছ পাওয়া যেত, গায়ে ছিল অস্পষ্ট লাল- নীল রং। আর ছিল ভোলা মাছের মতো একরকম মাছ। বনফুল মাছ-গুলোকে বড়ো-বড়ো শিশিতে পুরে রাখতেন। মুড়ি ছিল তাদের খাদ্য। কিন্তু তাদের ওভাবে বাঁচানো যেত না। যেদিন মাছ মরে ভেসে উঠত, সেদিন শিশুমনে গভীর শোকের ছায়া পড়ত। মনে হত কোনো পরমাত্মীয় চিরকালের মতো চলে গেল।

জননী-সম্পর্কে বনফুল লিখেছেন, অমন পবিত্র উজ্জ্বল শাণিত চরিত্র বড়ো একটা দেখা যায় না। তিনি আচার-আচরণ; নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলতেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি ব্রাহ্মণ্য আচারের গণ্ডি অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারতেন। বনফুল যখন মেডিক্যাল কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর ডবল নিউমোনিয়া হয়। চিকিৎসায় ফলোদয় না হওয়ায় ডা. বনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে, উঠোনের আমগাছের নীচে প্রকৃতির মুক্ত আলো-বাতাসে তিনি রোজ কাটাতেন আর রোজ একটি করে মুরগির মাংস আর তিন-চার চামচ কডলিভার অয়েল খেতেন। আর কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার হয়নি। বাড়িতে মৈথিল ঠাকুর ছিল, সে মুরগি রাঁধতে রাজি হল না। তখন মা নিজেই মুরগি রান্না করে দিতেন; পরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে উঠতেন।

বনফুলের পিতা কিন্তু আচার-আচরণে উদারপন্থী ছিলেন। সে-যুগের তুলনায় বড়ো বেশি প্রগতিশীল, খাওয়ার কোনো বাছবিচার ছিল না। যার-তার হাতে খেতে তাঁর

কোনো আপত্তি ছিল না। সন্ধ্যাহ্নিক করতেন না। ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তাঁর ছোটোভাই অবশ্য এইসব ম্লেচ্ছাচার পছন্দ করতেন না, কিন্তু দাদার কোনো আচরণের প্রতিবাদ করার সাহসও তাঁর ছিল না। বাবার ও কাকার আচার-আচরণের এই বৈপরীত্য বনফুলের 'মানুষের মন' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। নরেশ ও পরেশ দুই সহোদর। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক, আর একজন বৈষ্ণব। উভয়ে স্নাতকোত্তর উপাধিধারী। নরেশ কেমিস্ট্রিতে, পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই অকৃতদার। তৃতীয় সহোদর তাপসের পুত্র, পল্টুকে উভয়েই সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসত। পল্টুর যখন ষোলো বছর বয়স তখন সে জ্বরে আক্রান্ত হয়—টাইফয়েড। স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক গেলেন অ্যালো-প্যাথিক ডাক্তারের কাছে। বৈষ্ণব ধরলেন কবিরাজকে। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল না হওয়ায় অবশেষে জ্যোতিষ ও তারকেশ্বরের দৈব ওষুধ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হল। বৈজ্ঞানিকের শেষ অস্ত্র ইনজেকশন, বৈষ্ণবের স্বপ্নাদেশলব্ধ বাবা তারকনাথের চরণামৃত। কিন্তু যখন কিছুতেই কোনো প্রতিকার সম্ভব হল না, পল্টুর যখন শেষ অবস্থা, তখন উভয়েই জ্ঞান-বিশ্বাস হারিয়ে অসহায় এবং সেই চরম অবস্থায় দেখা গেল, মৃত্যুর হাত থেকে স্নেহের ধনকে আঁকড়ে রাখার জন্যে বৈষ্ণব ভক্ত শেষ আশ্রয় খুঁজছেন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাতে, আর বৈজ্ঞানিক চরম ভরসা স্থাপন করতে চাইছেন চরণামৃতের মাহাত্ম্যের ওপর। এই দুই সহোদরের চরিত্রচিত্রণে মনে হয় বনফুল পিতা ও পিতৃব্যের কথাই স্মরণ করেছেন। অবশ্য গল্পের পরিণতি রচনায় শিল্পীর নিজস্ব কল্পনাই ক্রিয়াশীল হয়েছে।

॥ ২ ॥

বনফুল স্কুলে গিয়েছিলেন একটু বড়ো বয়সে। ওঁদের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন তারাপদ পণ্ডিতমশায়। তাঁর স্নেহময় স্বভাব, সরলতা, ওঁদের শেখানোর জন্য তাঁর আগ্রহ যে নিখাদ-নির্মল ছিল, সে বিষয়ে বনফুলের কোনো সন্দেহ ছিল না।

ওঁদের বাড়িতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই গানবাজনার একটা আসর বসত। বনফুলের তখনও পড়াশোনার বালাই ছিল না। তাই, উনি যতক্ষণ পারতেন, ওই আসরে বসে থাকতেন। ওঁর বাবার একটা থিয়েটার পার্টি ছিল। সে-পার্টির অনেক লোকের আস্তানা ছিল ওঁদের বাড়িতে। থিয়েটারের রিহার্সাল হত এবং তাতে ওই অঞ্চলের বহু লোক এসে মিলিত হত। ওই গানবাজনার আসরে শিশুদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। বনফুলের শিশুমনে ওদের অনেকেরই ছাপ পড়েছিল। পরে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ওরা স্থান পেয়েছে।

বাড়িতে সাহিত্যের পরিবেশও ছিল। বাবা সেকালের অনেক নামজাদা পত্রিকা কিনে পড়তেন। বান্ধব, সুপ্রভাত, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, বসুমতী, হিতবাদী বাড়িতে নিয়মিত আসত। তাই, বনফুলের বাল্যকালটা একটা সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল। মতিহারিতেই কেটেছিল ওঁর বাল্য ও কৈশোরকাল।

১৯১৪ সালে বনফুল সাহেবগঞ্জে গিয়ে সেখানকার রেলওয়ে হাইস্কুলে ফোর্থ ক্লাসে ভর্তি হলেন। থাকতেন স্কুলের বোর্ডিংয়ে। বাড়ির পরিবেশ থেকে বোর্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রথম-প্রথম ভালো লাগত না। কিন্তু ততদিনে বনফুলের সাহিত্যপ্রেরণা মুখরিত হয়েছে। হাতেলেখা মাসিকপত্র প্রকাশিত হল। পত্রিকার নাম 'বিকাশ'। তাতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য—সবই বনফুলকে লিখতে হত।

এরপর শুরু হল মুদ্রিত কাগজে লেখা। বনফুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তখন কালীপ্রসাদ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় তাঁর কবিতা মুদ্রিত হয়। এজন্য বনফুলের বরাতে জুটল ভর্ৎসনা। স্কুলের এক পণ্ডিতমশাই তাঁকে বললেন, 'তোমার বাবা যে পয়সা খরচ করে তোমাকে বোর্ডিং-এ রেখেছেন, তা কি পদ্য লেখার জন্য?'

তখন তিনি ছদ্মনামে লেখা শুরু করলেন। ছেলেবেলায় তাঁকে অনেকে 'জংলিবাবু' বলে ডাকত। সেই নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জংলিবাবু হলেন 'বনফুল'। ওই নামে নানা পত্রিকায় তিনি কবিতা পাঠাতে লাগলেন। কিছু কিছু ছাপাও হল।